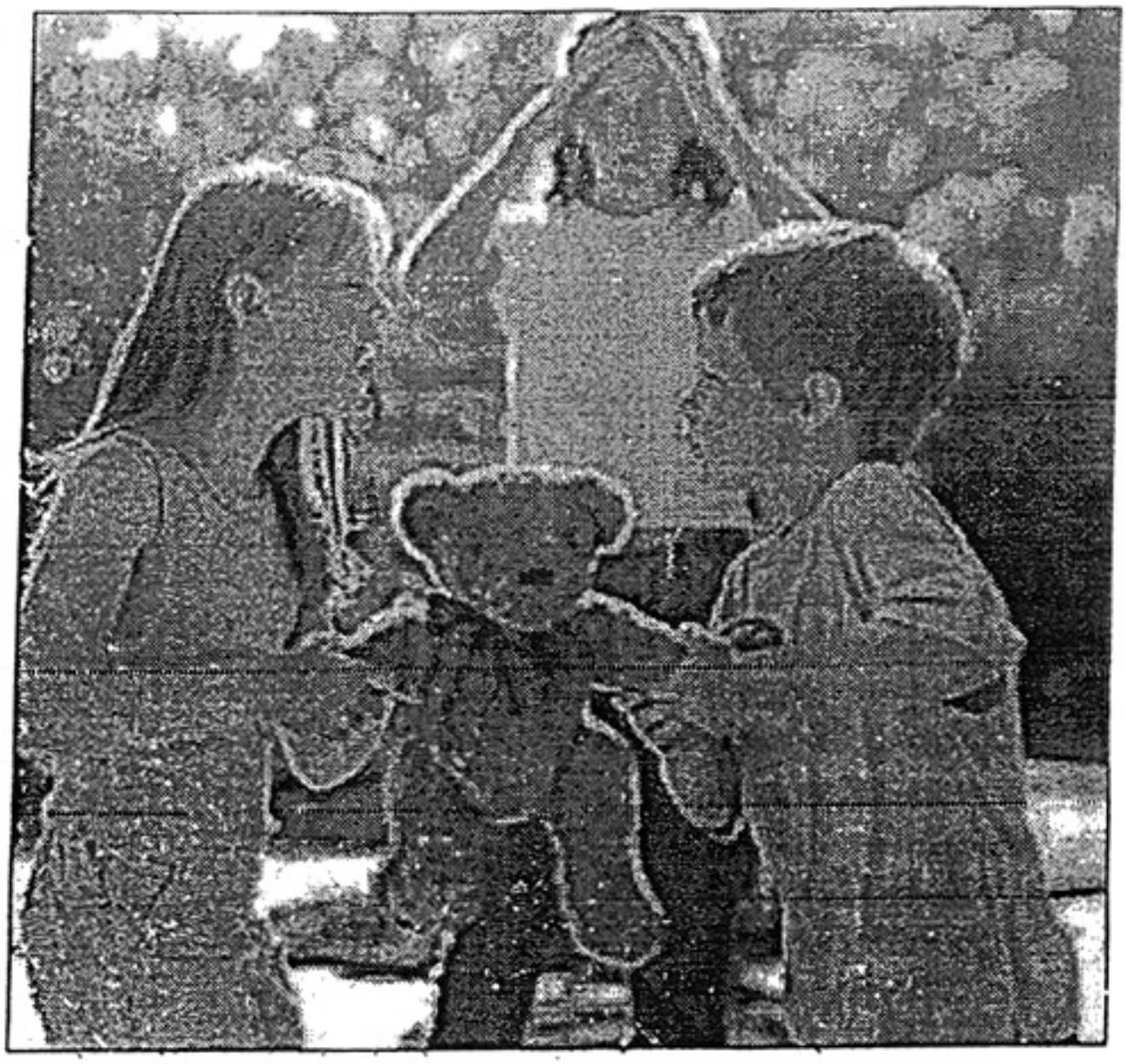

মনোসংযোগে অক্ষমতা

ডাঃ অঞ্জন ভট্টাচার্য
(শিশু বিকাশ বিশেষজ্ঞ,
অ্যাপেলো গ্লেনিগল্‌স হসপিটাল)
মোবাইল : ৯৮৩০০৩২৯৬৮

তমোঘ্নর বাবা-মা ক্যালিফোর্নিয়ায় থাকে। ছেলেকে নিয়ে তাদের ভারি দুশ্চিন্তা। স্কুলে দেওয়ার পর থেকেই ঝামেলা। নানা ভাবে স্কুলের টিচাররা ইঙ্গিত দিতে শুরু করলেন যে তমোঘ্নর দুষ্টুমিটা সাধারণ দুষ্টুমি নয়। গোড়ার দিকে ওরা অত গা করেননি। কিন্তু স্কুলের চাপাচাপিটা বাড়াবাড়ি হতে ওরা ব্যাপারটাকে একটু সিরিয়াসলি নিলেন।

নিমরাজি হয়েও ওরা ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেলেন তমোঘ্নকে। সাহেবের দেশে সবেতেই বাড়াবাড়ি, এই ভেবে। বাচ্চারা কমবেশি একটু-আধটু দুষ্টুমি তো করতেই পারে। হ্যাঁ—তমোঘ্নর দুষ্টুমিটা কিছুটা বেশিই, সে কথা স্বীকার করতেই হবে। তা বলে একেবারে ডাক্তার-বদ্যি? দুষ্টুমি সারাতে? হাসব না কাঁদব?

সাহেব ডাক্তার তমোঘ্নকে দেখে বললেন যে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। তমোঘ্নর সিম্পটমগুলো এ.ডি.এইচ.ডি-র মতো, তবে এ ব্যাপারে যে ডাক্তারেরা কাজ করেন, তাদের বলা হয় ডেভেলাপমেন্টাল পেডিয়াট্রিশিয়ান বা সাদা বাংলায় শিশু বিকাশ বিশেষজ্ঞ। উনি তমোঘ্নকে ওদের চাইল্ড ডেভেলাপমেন্টাল সেন্টার বা শিশু বিকাশ কেন্দ্রে রেফার করে দিলেন। বললেন যে একেবারে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। অল্প বয়সে বুঝতে পারা গেলে মেডিকেল সাইন্স এখন এতটাই এগিয়েছে যে এ.ডি.এইচ.ডি নিয়ে চিন্তিত হওয়ার কিছুই নেই। বাবা-মা ভাবলেন যে চিন্তিত তো বাপু আমরা নই, স্কুলই প্রায় ঘাড়ে ধরে পাঠাল তাই। তখন ডাক্তারবাবু একটা কথা বললেন যেটা শুনে ওরা মনে মনে ঠিক করে ফেললেন যে শিশু বিকাশ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ একবার নিয়েই ফেলা যাক। উনি বললেন যে রোগটা ভয়ের নয়। ভয়টা অভিভাবকদের গাফিলতিকে। কেননা গোড়ার দিকে বিজ্ঞানসম্মত উপায় ব্যবহার করলে সত্যিই কোনো ভয় থাকে না। ভয়ের হয়ে দাঁড়ায় যদি অল্প বয়সে এর প্রতিবিধানের বন্দোবস্ত না করা যায়। বেড়ে বেড়ে যখন বুঝতে পারার অবস্থায় আসে, ততদিনে ভিতরে ভিতরে শিশুটি এমন গোলমাল পাকিয়ে গেছে যে তখন প্রতিবিধান হয়ে দাঁড়ায় হয় অসম্ভব, নতুবা ভারী কষ্টের। ডাক্তার বললেন, 'ভেবে দেখুন, তমোঘ্নর এ.ডি.এইচ.ডি হয় আছে, না হয় নেই। বিশেষজ্ঞের কাছে যাওয়ার দরুন কিন্তু তমোঘ্নর অসুখটা তৈরি হওয়া সম্ভব নয়। বরং না থাকলে বিশেষজ্ঞ সেটা 'রুল আউট' করতে পারবেন। অন্যথায় যে রোগ

তমোঘ্নর ভিতরে ভিতরে বাড়ছে সেটাই শুধু ধরা পড়বে মাত্র। ডায়াবেটিসের রোগীরা যেমন ভ্রান্ত চিন্তা করে, রক্তে সুগার টেস্ট না করালেই যেন রোগটা ভিতরে ভিতরে ক্ষতি করছে না—এক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞের কাছে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। নইলে ভবিষ্যতে বাবা-মা হিসেবে খুব অপরাধবোধে ভুগতে হতে পারে যে সময় থাকতে ছেলেকে যখন ভালো করা যেত, তখন নিজেদের অমূলক ভয়ে আমরা সুচিকিৎসায় গাফিলতি করেছি।

উনি আর একটা পরামর্শও দিলেন, যে শিশু বিকাশ বিশেষজ্ঞের কাছে যাওয়ার আগে বাবা-মা যদি একবার এ.ডি.এইচ.ডি সম্বন্ধে ইন্টারনেটে একটু পড়াশুনো করে নেন। কনসালটেনশন শেষ করার আগে উনি বারে বারে বলে দিলেন যে এই অবস্থায় দুশ্চিন্তা করার মতো কিছুই নেই। বাবা-মা যেন অকারেণ ঘাবড়ে না যান।

মনে মনে একটু ঘাবড়ালেও ডাক্তারবাবুর কথা ও যুক্তি শুনে ওরাও ঠিক করে ফেললেন যে না ঘাবড়ে গিয়ে বরং ওনার কথা মতোই কাজ করা যাক। ডাক্তারের রেফারেন্স নিয়ে বিশেষজ্ঞের অ্যাপয়েন্টমেন্ট ঠিক করতে করতে ওরা ইন্টারনেটের মাধ্যমে পড়াশুনো সেরে ফেললেন।

দেখলেন যে এ.ডি.এইচ.ডি মানে হল অ্যাটেনশন ডেফিসিয়েন্সি হাইপার অ্যাক্টিভিটি ডিসঅর্ডার। অ্যাটেনশন ডেফিসিয়েন্সি অর্থাৎ মনোসংযোগের অক্ষমতা ও হাইপার অ্যাক্টিভিটি ডিসঅর্ডার অর্থাৎ অত্যধিক দুরন্ত হওয়ার রোগ।

এই রোগ যেহেতু সাধারণ চোখে ধরা পড়ে না তাই এই রোগ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল না থাকলে রোগ হিসেবে বোঝাই যায় না।

মস্তিষ্কের অভ্যন্তরীণ কার্যকলাপের অস্বাভাবিক কার্য-কারণের ফলে একটি শিশুর চরিত্রে তিনভাবে তার প্রভাব পড়ে।

• ইনঅ্যাটেনশন অর্থাৎ মনোসংযোগে অক্ষমতা।

• ইমপালসিভিটি অর্থাৎ অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করতে পারার ক্ষমতার অভাব।

• হাইপার অ্যাক্টিভিটি বা হাইপার কাইনেসিস অর্থাৎ হাতে পায়ে চাঞ্চলের আধিক্য।

মনোসংযোগে অক্ষমতা বহিঃপ্রকাশের কিছু উদাহরণ হল—

• কথা শুনে ভালো করে সেই মতো কাজ করার অক্ষমতা। অর্থাৎ বাবা-মা দেখেন যে বাচ্চা কথা শুনছে না।

• বাড়িতে এবং স্কুলে কোনো কাজ, যেমন পড়াশুনো, একটু বেশি সময় দিয়ে এক জায়গায় বসে করতে পারার ক্ষমতা না থাকা।

• বাড়িতে যেমন, স্কুলেও তেমন কেবলই জিনিসপত্র হারিয়ে ফেলা বা কোনটা কোথায় আছে মনে করতে না পারা।

• কথা যেন শুনেও শুনলো না মনে হওয়া।

• যেখানেই একটু যত্ন নিয়ে, সাবধানে ধরে ধরে কাজ করার প্রয়োজন, সেখানেই ধৈর্যের অভাব লক্ষ্য করা।

• বড়ই ছড়ানো ছিটানো গোছের হওয়া।

• চিন্তা-ভাবনা, প্ল্যান মাফিক কিছু করার দক্ষতার অভাব।

• ভুলো-মাস্টার—সারাক্ষণই সবকিছু ভুলে ভুলে যাওয়া।

• খুব চট করে মন ঘুরিয়ে দেওয়া যায় বা ডিস্ট্রাকটেড।

অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা না করে কাজ না করতে পারার কিছু উদাহরণ হল—

• যাকে-তাকে যা-তা বলে ফেলা
• মুখ ভেঙচে দেওয়া
• লোককে খুঁচিয়ে রাগিয়ে দেওয়া
• মারামারিতে সহজে জড়িয়ে পড়া
• অবাঞ্ছিত ভাষা ব্যবহার করে ফেলা
• চুপটি করে একটুও প্রায় থাকতে না পারা
• সহজে ধৈর্যচ্যুতি হওয়া
• আবদার ধরা, গোঁ ধরা, সহজে রেগে যাওয়া
• অন্যের পড়ে যাওয়া দেখে তার সামনেই হেসে ফেলা

• স্কুলে সব প্রশ্নের একাই উত্তর দিয়ে ফেলার বদভ্যাস ইত্যাদি।

অত্যধিক ছটফটানির উদাহরণ হল—

• বসে বসে পা নাচানো, আঙুল নিয়ে নাড়াচাড়া করা, টেবিল বাজানো, আওয়াজ করা

• অধৈর্য হওয়া, পায়চারি করে যাওয়া।

• হাতে-পায়ে চঞ্চল এতটাই যে চুপ করে বসতে বললে বসতেই পারে না।

• একবার এটা ধরছে, একবার ওটা করছে—ঠান্ডা হয়ে এক মুহূর্ত বসার নামগন্ধ নেই।

• এখানে চড়ে পড়ছে, ওটার ওপর উঠে পড়ছে, লাফিয়ে বেড়াচ্ছে, ঝাঁপিয়ে বেড়াচ্ছে।

• ভাঙচুর করার ওস্তাদ (ডেস্ট্রাকটিভিটি)।

• কাগজ ছিঁড়ে উড়িয়ে দিচ্ছে, বালিশ ফাটিয়ে পালক ছড়িয়ে দিচ্ছে।

• পশু-পাখির ওপর কখনো কখনো যেন একটু নৃশংসই হয়ে পড়ছে।

• কোনো যেন ক্লান্তি নেই। সকাল থেকে দুষ্টুমির সেই যে শুরু, যতক্ষণ না ক্লান্ত বিধ্বস্ত হয়ে ঘুমোতে যাচ্ছে, ততক্ষণ বাড়ি মাথায় করে রাখছে।

• একজনের পর আর একজনের পালা, এই ব্যাপারটা বুঝতে অক্ষমতা ইত্যাদি।

একটি এ.ডি.এইচ.ডি বাচ্চার ভিতর এই সব সিম্পটমের প্রত্যেকটিই যে থাকতে হবে তা নয়। সেই ব্যাপারটা বিশেষজ্ঞরা আন্তর্জাতিক মান মেনে বিচার করে থাকেন। দেখেন যে বাচ্চার এই ব্যবহার সমস্ত সামাজিক পরিস্থিতিতেই হচ্ছে কি না। অর্থাৎ, সে বড়িতেও যেমন বেয়াড়া,

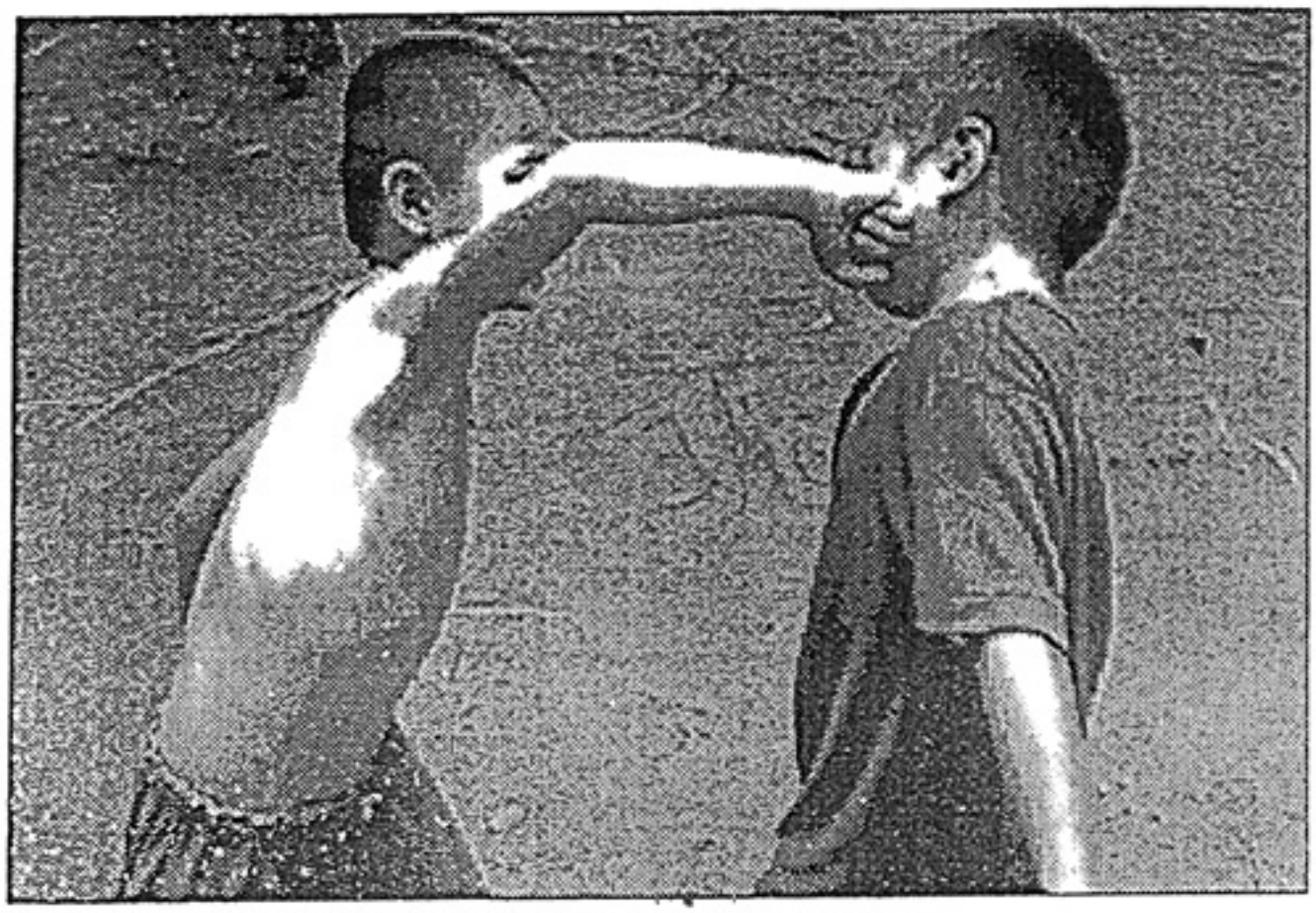

স্কুলেও কমবেশি সেরকমই বেয়াড়াপনা করছে কি না। এবং যাবতীয় সিম্পটম যে আছে, তা বেশ অনেকদিন ধরেই টানা (তিন থেকে ছ' মাস) চলছে কি না।

এছাড়াও বিশেষজ্ঞ দেখবেন যে শিশুটির এই সব ব্যবহারের পিছনে আর কোনো মেডিক্যাল কারণ আছে কি না। যেমন, লুক্কায়িত মৃগী রোগ দুষ্টুমি হিসেবে ধরা দিতে পারে। ঘন ঘন সর্দি-কাশির সমস্যা মনোসংযোগে ঘাটতির কারণ হতে পারে বা লুক্কায়িত কোষ্ঠকাঠিন্য বাচ্চাকে মারমুখি করে তুলতে পারে।

বিশেষজ্ঞ তা ছাড়াও দেখবেন অন্য কোনো প্রাথমিক রোগের জন্য বাচ্চা এ.ডি.এইচ.ডি-র সিম্পটম নিয়ে দেখা দিচ্ছে কি না, যেমন অটিজম, ডিস্‌লেক্সিয়া, মানসিক বা শারীরিক বৈকল্য।

তমোঘ্ন বেশ মারকুটে। বাবার চশমা ভেঙেছে বেশ কয়েকটা। বাড়ি সাফা করে রেখেছে—কোনো ভঙ্গুর বা দামী জিনিস দিয়ে বাড়ি সাজানো সম্ভব হয়নি। মা-কে তো যখন-তখন তুলোধনা করেই রেখেছে। তমোঘ্নর ঠেলায় বাড়িতে ওরা সাহেবসুবো প্রতিবেশিদের নেমন্তন্ন করেই না—যদি তমোঘ্নর কাণ্ডতে ওরা ভারতীয়দের সম্বন্ধেই বাজে ধারণা করে বসে। ওদের সামাজিক বৃত্ত তাই এখন ভারতীয় উপমহাদেশের বন্ধুবান্ধবের মধ্যেই সীমিত।

তমোঘ্নকে সবাই স্নেহও করে। সাগরকাকু ওকে 'ডেনিস্ দ্য মিনেস্' বলে ডাকেন আদর করে। সবাই কমবেশি তমোঘ্নর চুল টানা বা গুলতির গুঁতো খেয়েছেন। তারা সবাই বলেছেন, কী আছে? ওরা অনেকেই ছোটবেলায় ডানপিটে ছিলেন। স্কুলে যেতে শুরু করলেই তমোঘ্ন আস্তে আস্তে শান্ত হতে শিখে যাবে।

কিন্তু, সেই স্কুলই যখন অন্য কথা বলছে তখন ব্যাপারটার এসপার-ওসপার না করলেই নয়। বিশেষ করে একেবারে ছোট ছিল যখন, তখন এক কথা। প্রায় এক বছর স্কুলে থাকার পরেও যখন সমস্যা যাচ্ছে না, সত্যি কথা বলতে কী, এককালের আহ্লাদিত কাকু-কাকিমার দলও আজকাল একটু অসহিষ্ণু হয়ে পড়ছেন। দু' এক জন ঠারে-ঠোরে ইঙ্গিতও দিয়েছেন যে তারা তাদের ছেলে হলে দু' থাপ্পড়ে এতদিনে ব্যাপারটায় ইতি টেনে দিতেন। কেউ কেউ তো তাদের নিজেদের বাচ্চাদের নিয়ে তমোঘ্নর কাছে আসতেও কেমন যেন দ্বিধা বোধ করছেন বলে মনে হচ্ছে—যদি তারা তমোঘ্নকে দেখে বেয়াড়াপনা শিখে ফেলে? তমোঘ্ন কি মার্কা মারা হয়ে যাচ্ছে?

বিশেষজ্ঞের সাথে দেখা করার দিন বাবা-মা দুরু দুরু বুকে তমোঘ্নকে নিয়ে চাইল্ড ডেভেলাপমেন্ট সেন্টারে উপস্থিত হলেন। কারুর মুখে কোনো কথা নেই। মনে হচ্ছে যেন বলির পাঁঠা। বাবা-মা'রই যেন দণ্ডাদেশ হতে চলেছে।

বিশেষজ্ঞের ঘরটি বেশ প্রশস্ত। কতিপয় খেলনা ছাড়া খুব বেশি জিনিসপত্রও নেই। তমোঘ্নর পেডিয়াট্রিশিয়ান যেমন ১৫-২০ মিনিটের মধ্যেই সব দেখা-লেখা সেরে ফেলেন, এই বিশেষজ্ঞ কিন্তু তা না করে প্রায় ৪৫ মিনিট

লুক্কায়িত মৃগী রোগ দুষ্টুমি হিসেবে ধরা দিতে পারে। ঘন ঘন সর্দি-কাশির সমস্যা মনোসংযোগে ঘাটতির কারণ হতে পারে বা লুক্কায়িত কোষ্ঠকাঠিন্য বাচ্চাকে মারমুখি করে তুলতে পারে।

ধরে ওদের সঙ্গে সময় কাটালেন। তারই মধ্যে তিনি ওদের বিভিন্ন প্রশ্ন করলেন, তমোঘ্নর সঙ্গে কিছুক্ষণ খেললেন, সেই ফাঁকে তমোঘ্নকেও কিছু কিছু প্রশ্ন করলেন। তমোঘ্নর সাথে ভাব হয়ে যাওয়ার পর তমোঘ্নও সহজেই পেট টিপে, বুক ঠুকে, স্টেথো বসিয়ে যা যা করা দরকার সবই করতে দিল—একটুও কাঁদল না। ধীরে সুস্থে সব দেখে শুনে সাহেব বললেন যে তমোঘ্ন তো দিব্যি সহযোগিতা করল। এটা খুবই আনন্দের কথা। কেননা, যদিও তমোঘ্নর সিম্পটমগুলো সব এ.ডি.এইচ.ডি-র তবু এই যে তমোঘ্ন এতক্ষণ ভদ্রছেলের মতো দিব্যি তালে তাল দিতে পারল, তার মানে এ.ডি.এইচ.ডি হলেও তমোঘ্ন চিকিৎসায় খুব ভালো সাড়া দেবে। আর এ.ডি.এইচ.ডি কি না সেটা পাকা করার জন্য সাহেব কিছু ছাপা প্রশ্নাবলী দিলেন। তার একটা বাবা-মা ভর্তি করে আনবেন, একটা স্কুল ভর্তি করে দেবে। আর সেই নিয়ে পরের দিন সাহেব শুধু বাবা-মা'র সাথে বসে নিয়ম মাফিক প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে তমোঘ্নর এ.ডি.এইচ.ডি-র পরীক্ষা করে ফেলবেন।

তারই মধ্যে বাবা-মা যেন তমোঘ্নর চোখ, শ্রবণশক্তি আর দাঁতের চেক আপ করিয়ে রাখেন। এবং বিশেষজ্ঞের দেওয়া চিঠি নিয়ে তারা যেন তমোঘ্নর মনের বয়স মাপার জন্য যিনি কাজ করেন তার থেকে তার মনের বয়সটি মাপিয়ে নেন। কেননা, অনেক সময় আপাতদৃষ্টিতে বোঝা না গেলেও শুধুমাত্র চোখে ভালোমতো দেখতে না পাওয়ার জন্য, দু' কানে শ্রবণের তারতম্য হওয়ার জন্য বা বলতে না পারা দাঁতের বা মাড়ির কষ্টের থেকেও অনেক বাচ্চা দিনের পর দিন শুভামি চালিয়ে যেতে পারে। শিশু তো, সব সময় কষ্ট বা অস্বস্তিটা অন্য ভাবে প্রকাশ করা যায় হয়তো তা বুঝেই উঠতে পারে না।

বাবা-মা ভাবল এ তো মহা গেরো। ডায়াগনোসিস হতেই তো বর্ষদিনের ধাক্কা মনে হচ্ছে। তার ওপর ছেলেকে নিয়ে এই ডাক্তার, সেই ডাক্তার—ব্যস্ত চাকরি জীবনে এ কী চাট্টিখানি কথা? তবে এ সাহেবও ওই একই কথার সাবধানবাণী শোনালেন। দেরি—নৈব নৈব চ। নইলে পরে পস্তাতে হবে। সাহেব বোঝালেন যে চাকরিজীবন যাতে ভবিষ্যতেও সুরক্ষিত থাকে, সেই জন্য তাদের শিশুর রোগ নির্ণয় ও প্রতিবিধান আশু কর্তব্য।

কিছুটা ভয়, কিছুটা বিরক্তি নিয়ে তাই নমো নমো করে বাবা-মা চেক-আপ ও প্রশ্নাবলীর অধ্যায়গুলো নামিয়ে ফেললেন। চেক-আপে কোনো দোষ পাওয়া গেল না। পরের দিন বাবা-মা হাজিরা দিলেন ইন্টারভিউয়ের জন্য।

বিশেষজ্ঞ প্রায় এক ঘণ্টার ওপর সময় নিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ওদের জীবন, সংসার, তমোঘ্নর এক একটি ব্যবহার চিরে চিরে যাচাই করলেন। বাবা-মা'র উত্তরের ভিত্তিতে নম্বর দিলেন আন্তর্জাতিক মান সম্বলিত প্রশ্নের উত্তরপত্রে।

বাবা-মা যখন ভাবছেন যে এবার এসপার-ওসপার কিছু একটা জানা যাবে, ভদ্রলোক এই বলে জল ঢেলে দিলেন যে, এখন ওনার কাছে সমস্ত ক্লিনিক্যাল তথ্য সংকলিত হয়েছে, উনি

নিজে বাচ্চাটিকে দেখে, বাবা-মা'র লেখা এবং মৌখিক প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে, পেডিয়াট্রিশিয়ানের রেফারাল দেওয়া চিঠিতে এবং স্কুলের থেকে ফেরৎ পাওয়া প্রশ্নোত্তরে। এবার উনি একবার স্কুলে গিয়ে নিজের চোখে তমোঘ্নকে দেখবেন। তারপর উনি বাবা-মা-কে ডেকে পাঠাবেন এ.ডি.এইচ.ডি কি না তা বলার জন্য।

উনি বোঝালেন যে, সব বাচ্চার ক্ষেত্রে যে বিশেষজ্ঞকে স্কুলে গিয়ে দেখতে হয় তা নয়। তবে যেখানে সীমান্তবর্তী বলে সন্দেহ করা হয়, অর্থাৎ যেখানে সন্দেহের অবকাশ থাকে, সেখানে সরাসরি অবজারভেশন রোগ নির্ণয়ে সাহায্য করে।

তারপর একদিন সে ডাক এল। সব কাজ ফেলে তো ছুটে যাওয়া যায় না, যতই ইচ্ছে করুক যে একছুটে এক্ষুনি গিয়ে জেনে আসি। বিশেষজ্ঞের সেক্রেটারির সাথে কথা বলে, দু'জনের চাকরি থেকে ছুটির বন্দোবস্ত করে যেতে যেতে প্রায় সপ্তাহ খানেক লেগে গেল। এই সময়টা যেন আর কাটতেই চায় না। শেষমেশ দিনটা যেদিন এল ওরা ভলো করে ব্রেকফাস্টই করতে পারল না। সময়ের এক ঘন্টা আগেই গিয়ে উপস্থিত। উৎকণ্ঠা নিয়ে বসে থাকা, কখন ডাক আসে।

ডাক আসতে লাফিয়ে উঠল দু'জন। যথাসম্ভব ধৈর্যের সাথে গিয়ে বসল বিশেষজ্ঞের সামনে। সাহেব দু'এক কথায় টুকিটাকি সম্ভাষণ সেরেই কাজের কথা সেরে ফেললেন। উনি বললেন যে তমোঘ্ন একটি অপরূপ দেবশিশুসম বাচ্চা। তমোঘ্ন কষ্ট পাচ্ছে তার এ.ডি.এইচ.ডি রোগ জনিত কারণে। এ.ডি.এইচ.ডি একটি এমন রোগ যে রোগে আক্রান্ত শিশুরা তাদের মস্তিষ্কের বিশেষ বিশেষ স্থানে কিছু রাসায়নিক পদার্থের সামঞ্জস্যের অভাবে ভোগে। মস্তিষ্কের এই স্থানগুলো মানুষের চিন্তা ভাবনার প্রক্রিয়াকে গোছ-গাছ করার কাজে ব্যাপৃত থাকে। যেহেতু এই রাসায়নিক সামঞ্জস্য থাকে না, তাই শিশুটি শত চেষ্টাতেও নিজের মনোসংযোগের ক্ষমতা বাড়াতে অক্ষম হয়ে পড়ে।

এই শিশুদের দুই প্রকার সাহায্য দিলে তারা তাদের এই দুষ্টমির প্রবণতা কমিয়ে ফেলতে পারে। তারা কমাতেই চায়। কিন্তু শারীরবৃত্তীয় কারণের জন্য তারা সংযত ব্যবহারে অপারগ হয়ে পড়ে।

একটি পদ্ধতি হল ওষুধের ব্যবহার এবং দ্বিতীয় পদ্ধতি হল ব্যবহারজনিত চিকিৎসা পদ্ধতি। এই দুই পদ্ধতির সমন্বয়ে তমোঘ্ন ধীরে ধীরে সংযত হতে শিখবে এবং তার মনোসংযোগ বাড়তে থাকবে।

এই রোগ বাবা-মা'র দোষে হয় না। এ.ডি.এইচ.ডি পরিবারের বাচ্চা মানুষ করার ভুলে তৈরি হয় না (তবে এ.ডি.এইচ.ডি থাকলে তার ওপরে যদি পরিবারের লোক বাচ্চার সাথে কীভাবে সর্বদা সুব্যবহার করতে হয় না জানেন, তবে এ.ডি.এইচ.ডি'র বাচ্চার কষ্ট, সমস্যা ও রোগের প্রকোপ বহুলাংশে বৃদ্ধি পায়)। এই রোগ বাবা বা মা চাকরি না করে বাড়ি বসে তমোঘ্নকে সারাদিন সারারাত মানুষ করলেও হত। পেটে থাকতে মা'র কোনো কিছু করার দোষে বা খাওয়ার দোষে এ.ডি.এইচ.ডি হয় না। ছোট বয়সে ভুল করে কিছু মুখে দেওয়ার ফলেও এই রোগ হয় না। অতিরিক্ত চিনি বা শর্করা জাতীয় কিছু খাওয়ার জন্যও এই রোগ হয় না (যদিও শর্করা জাতীয় খাবার, চিনি বা মিষ্টি খেলে দুরন্তপনা বেড়ে যেতে পারে)। বেশি মাত্রায় টিভি দেখার জন্য এ.ডি.এইচ.ডি হয় না। ভিটামিনের অভাবের জন্য এ.ডি.এইচ.ডি হয় না।